মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ষষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, আগস্ট ২০২৫

তাজউদ্দীন আহমদ জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি

২৩ জুলাই ২০২৫

তাজউদ্দীন আহমদ তার দেশপ্রেম, নিষ্ঠা, সততা, আত্মত্যাগ, নৈতিকতা, মহত ব্যক্তিত্ব সবকিছু মিলিয়ে ছিলেন একজন অনন্য ব্যক্তিত্ব এবং নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি যে ভূমিকা পালন করেছেন সেটা বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায়। ২৩ জুলাই ২০২৫ মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ-এর জন্মশতবর্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত অনুষ্ঠানে আলোচকরা তাদের বক্তব্যে তাজউদ্দীন আহমদ সম্পর্কে এমন মন্তব্য করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ৩টি পর্ব রয়েছে- প্রস্তুতি পর্ব, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ এবং বিজয় পরবর্তী পর্ব, এই তিনটি পর্বেই তাজউদ্দীন আহমদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই ভূমিকার পরিপূর্ণ প্রকাশ ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পূর্ণতা পাবে না। তিনি বলেন, স্বাধীনতার প্রস্তুতি পর্বে ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তরের পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত যখন এই অঞ্চলের মানুষ গণতন্ত্র এবং জাতীয় অধিকারের জন্য লড়াই করছে তখন তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ট সহচর হিসেবে, ছায়াসঙ্গী হিসেবে এদেশের মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছেন, মানুষের মধ্যে এই বোধকে জাগ্রত করেছেন যে, স্বাধীনতা ছাড়া এদেশের মানুষের মুক্তি হবে না। একাত্তর সালের মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে পাকিস্তানী সামরিক জান্তার সাথে আলোচনা চলাকালেও তিনি স্বাধীনতার সপক্ষে অবস্থানটি যুক্তিতর্ক দিয়ে তুলে ধরেছিলেন। ডা. সারওয়ার আলী মনে করেন সকল জাদুঘরের দায় হচ্ছে ইতিহাসের

৫-এর পৃষ্ঠার দেখুন

রোকেয়ার সুলতানার স্বপ্নের প্রেরণায় বঞ্চিত শিশুদের সৃজনশীল শিল্পকর্ম প্রদর্শনী

রোকেয়ার বিজ্ঞানমনস্ক রচনা 'সুলতানার স্বপ্ন' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তত্ত্বাবধানে 'স্বপ্ন দেখা ভবিষ্যৎ : রোকেয়ার সুলতানার স্বপ্ন-এর প্রেরণায় শিশুদের নিয়ে সৃজনশীল যাত্রা' শিরোনামে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ জুন শুরু হওয়া এই কর্মশালায় ৮টি সেশনে শিল্পী রূপকল্পা চৌধুরীর কিউরেশনে 'সুলতানার স্বপ্ন' পাঠের পর লিডো পিস হোমের ২০ জন শিশু তিনটি ভিন্ন মাধ্যমে, পেপার কোলাজে নিজেদের প্রতিকৃতি তৈরি, তারের মাধ্যমে টু-ডি ও থ্রি-ডি অবজেক্ট তৈরি এবং মাটির কাজের মাধ্যমে নিজেদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছে। গত ২৬ জুলাই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে কর্মশালা উপস্থাপন অনুষ্ঠানে লিডো পিস হোমের পরিচয় ও বিভিন্ন শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়।

অনুষ্ঠানে লিডোর নির্বাহী পরিচালক ফরহাদ হোসেন বলেন, 'সুলতানার স্বপ্ন'র ধারণা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং লিডো শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা শিশুদের অনেক আশান্বিত করেছে। তারা সুলতানার স্বপ্ন ধারণ করে এগিয়ে যাবে। এই ধরনের উদ্যোগ শিশুদের বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের কর্মশালা আয়োজন করায় তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও শিল্পী রূপকল্পা চৌধুরীর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ভবিষ্যতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে আরও কাজ করার সুযোগ হবে এবং রোকেয়ার সুলতানার

২-এর পৃষ্ঠার দেখুন

My Experience in Working with the Children of LEEDO Peace Home

By Rupakalpa Chowdhury, Curetor

This project first took shape in my mind when I attended a seminar at the Liberation War Museum where Professor Lindsey K. Horner from the University of Edinburgh spoke about Rokeya's Sultana's Dream. I shared this idea with Mofidul Hoque Sir, whose encouragement gave it wings. He saw its potential and graciously connected me with LEEDO Peace Home. That's where this beautiful journey truly began.

In the first session, I began with storytelling—narrating Rokeya's Sultana's Dream to the children. They listened with curiosity and joy. We introduced ourselves to each other, shared stories about our lives, and talked about the themes of the story—freedom, dreams, and possibilities. It created a space of warmth and connection, laying the foundation for everything that followed.

From the second day, we began the wire sculpture workshop. Each workshop lasted for two days, and on the final day, we developed short texts inspired by Sultana's Dream, combining storytelling and art-making.

I introduced the wire medium to help the children enhance focus, explore spatial thinking, and experience the joy of creating something out of nothing. Though none had ever used wire before, they quickly embraced the challenge—twisting, bending, and shaping animals, abstract designs, and imaginative forms. Their enthusiasm and sense of discovery reminded me how resourceful young minds are when given trust and tools.

Next was the clay workshop, where I introduced terracotta relief techniques. The theme was personal dreams and future goals. The children eagerly sculpted their visions—not only as flat reliefs but also as small-scale 3D forms inspired by their daily surroundings. They explored andplayed, creating for joy, not just instruction. Many of them still keep their clay pieces, which makes me feel my purpose was met—to plant a seed of creative confidence that remains.

By the time we began the paper portrait workshop, our connection had grown. The children made radiant self-portraits—using not only paper but also buttons, stones, paper flowers, and other found materials. These portraits became layered expressions of identity, pride, and playfulness. Alongside this, we reflected on the themes of Sultana's Dream—freedom, equality, and alternative futures. The children's responses—innocent yet insightful—revealed their capacity to grasp big ideas when guided with care.

What continues to stay with me is how much these children achieved in such a short time, simply by being given space—space to feel safe, respected, and creative. If children living on the streets across Bangladesh had regular access to education and creativity, I believe our society would thrive emotionally, intellectually, and artistically.

I extend my heartfelt thanks to the Liberation War Museum for their financial support and to Mofidul Hoque Sir for his trust and visionary guidance. Their belief in nurturing children's imagination gave me the platform to carry out this work with sincerity and intent.

To LEEDO Peace Home, my deepest gratitude—for welcoming me, for believing in the value of art, and for standing by these children every day. And to the children—your laughter, your art, your dreams—you've given me more than I can express. You reminded me that art is not just something we make—it's something we live.

In the end, this was more than a series of workshops. It was a shared story—a journey of love, learning, and liberation.

The exhibition of the children's works will remain open to visitors at the Liberation War Museum until 4 August.

রোকেয়ার সুলতানার স্বপ্নের প্রেরণায় শিশুদের সৃজনশীল শিল্পকর্ম প্রদর্শনী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্বপ্ন ধারণ করে সুবিধাবঞ্চিত মেয়েরা এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কর্মশালার কিউরেটর ও শিল্পী রূপকল্পা চৌধুরী শিশুদের সৃজনশীলতার প্রশংসা করে বলেন, 'আমি যা ভেবেছি তার চেয়ে বেশি সৃজনশীলতা নিয়ে শিশুরা তিনটি মাধ্যমে নিজেদের প্রতিভা দেখিয়েছে। সৃজনশীল শিক্ষার মাধ্যমে সুলতানার স্বপ্নের মূলভাব শিশুদের কাছে পৌঁছে দেয়া ছিলো এই কর্মশালার উদ্দেশ্য। শিশুদের শেখানোর মাঝে আত্মিক শান্তি খুঁজে পাই মন্তব্য করে শিল্পী রূপকল্পা চৌধুরী বলেন, এই প্রকল্পের শুরু হয়েছিলো একটি স্বপ্ন থেকে, এমন এক স্বপ্ন যেখানে প্রতিটি শিশুর থাকবে স্বাধীন-চিন্তা, কল্পনার সাহস ও নিজের মতো তা প্রকাশ করার দক্ষতা।'

সমাপনী বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক লিডোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন 'পথশিশুরা সমাজের বাস্তবতা, সেইখানে সুলতানার স্বপ্ন বয়ে নিয়ে যাওয়া অনেক কিছুর কাকতালীয় সংযোগ। আজ শিশুদের শিল্পকর্মের যে উপস্থাপনাটা হলো এটা আমাদের ভেতরে শক্তি দিয়েছে। শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা কী ঘটাতে পারে সেটা আমরা এই কর্মশালার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করলাম। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে এই চিন্তাটা আরো ভাগাভাগি করে নেওয়া দরকার। আমরা কি করতে পারি লিডো তার একটা দৃষ্টান্ত। অন্যদিকে গোটা সমাজের সমর্থনে সেটা কীভাবে প্রস্ফুটিত হতে পারে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তার আরো একটি দৃষ্টান্ত। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সমাজের প্রতিষ্ঠান, মানুষের প্রতিষ্ঠান, জনগণের প্রতিষ্ঠান। সবাই এখানে সম্পৃক্ত হয়ে অনেক কিছু করাটা সম্ভব করে তুলছেন। লিডো, লিডো শান্তি নিবাসের শিশু এবং শিল্পী রূপকল্পা চৌধুরীকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, এই কর্মশালার মাধ্যমে সুলতানার স্বপ্নের অভিযাত্রা যে নতুন মাত্রা পেল সেটা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাবো।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মাইলস্টোন ট্র্যাজেডিতে হতাহতদের স্মরণে শোক প্রস্তাব পাঠ করে লিডো পিস হোমের শিশুরা। লিডো পিস হোমের কার্যক্রম সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন পিস হোমের সদস্য জেসমিন আক্তার ও সোহেল রানা।

'স্বপ্ন দেখা ভবিষ্যৎ : রোকেয়ার সুলতানার স্বপ্ন-এর প্রেরণায় শিশুদের নিয়ে সৃজনশীল যাত্রা' কর্মশালার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন পিস হোমের সদস্য সাথী। অনুষ্ঠান শেষে পথশিশুদের নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র 'হোয়ার দ্যা কিড্স হ্যাভ নো নেম' প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন ত্রপা মজুমদার। কর্মশালায় শিশুদের তৈরি পেপার কোলাজ, তার ও মাটির তৈরি শিল্পকর্মের প্রদর্শনী ২৬ জুলাই শুরু হয়ে ২ আগষ্ট পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হয়।

মির্জা মাহমুদ আহমেদ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

হিরোশিমা দিবস উদযাপন : ৬ আগস্ট ২০২৫

৬ আগস্ট ২০২৫ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আঙ্গিনা সেজে ওঠে শিক্ষার্থীদের বানানো কাগজের তৈরি সাদা সারস পাখিতে। আগারগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও এস ও এস শিশুপল্লীর শিশুরা সাদা সারস দিয়ে জাদুঘর প্রাঙ্গণ সাজিয়ে আণবিক বোমার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করা কিশোরী সাদাকো সাসাকিকে স্মরণ করে। হিরোশিমা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা, পাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্বাগত ব্যক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী বলেন, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে গণহত্যা ও নৃশংতার তাজা স্মৃতি বহন করে। আজ থেকে আট দশক আগে, বিজ্ঞান জগতের অন্যতম বৃহত্তম আবিষ্কার পারমাণবিক বোমা মানবসভ্যতা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট সকাল ৮.১০ মিনিটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত হয় প্রথম পারমাণবিক বোমা। মুহূর্তের মধ্যে মারা যায়, শিশুসহ অগনিত মানুষ, এবং পরবর্তীতে পারমানবিক বোমার তেজস্ক্রিয়াজনিত অসুখে মারা যায় অনেকে। তারপর থেকে ‘‘পারমাণবিক অস্ত্র’’ নামের এই বিভীষিকা বহু বছর ধরে চলতে থাকে। এখনও বিশ্বের নয়টি দেশে পর্যাপ্ত পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে, যা পৃথিবীকে বহুবার ধ্বংস করে দিতে পারে। একইভাবে ফিলিস্তিনের মানুষের ওপরও চলছে দমননীতি, যদিও ফিলিস্তিন জাতিসংঘের সদস্য নয়। জাতিসংঘ পারমাণবিক অস্ত্র ও তেজস্ক্রিয়তার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। আমরা মৃত্যুর পথে নয়, জীবনের পথে চলতে চাই। বাংলাদেশ ছিল প্রথম দেশগুলোর মধ্যে একটি, যারা পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (PNW) অনুমোদন করেছিল। আমরা শান্তিপ্রিয় জাতি। আমরা একটি উন্নত বিশ্ব গড়তে চাই, যেখানে পৃথিবী হবে শান্তির প্রতীক, যেমন হিরোশিমার সাদাকো সাসাকি শান্তির প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। উপস্থিত শিক্ষার্থীদের সাদাকো সাসাকির কাহিনী পাঠ করে শোনায় আগারগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বাংলাদেশস্থ জাপন দুতাবাসের রাষ্ট্রদূত মি. সাঈদা সিনিচি বিশেষ ধন্যবাদ জানান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে– যারা ১৯৯৯ সাল থেকে প্রতিবছর এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে আসছে। তিনি বলেন, হিরোশিমা দিবস উপলক্ষে এখানে উপস্থিত হতে পারা আমার জন্য এক বিশেষ আনন্দের বিষয়। আমি বিশেষভাবে তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানাই তোমরাই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্মাতা। আজ জাপানের হিরোশিমাসহ বিশ্বজুড়ে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বাংলাদেশের হিরোশিমা দিবস উদ্‌যাপন শান্তি ও পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের বার্তা ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ তরুণ প্রজন্মের প্রতি যারা আজ এখানে সমবেত হয়েছে। তোমাদের হাতে তৈরি কাগজের সারস (Origami Cranes) আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে, যা সাদাকো সাসাকির স্মৃতির সাথে জড়িত এবং হিরোশিমার ভুক্তভোগীদের আশা ও শান্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে। ধন্যবাদ বক্তব্যে ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব মফিদুল হক বলেন আজ ৬ আগস্ট হিরোশিমা দিবস। আজ আমরা স্মরণ করছি হিরোশিমায় সংঘটিত ৮০ বছর আগের মর্মান্তিক ঘটনাকে, যা শুধু জাপানের জন্য নয় বরং সমগ্র মানবজাতির জন্যই গভীর বেদনাময়। আমরা কৃতজ্ঞ যে জাপানের রাষ্ট্রদূত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় জাপান সরকার যে অসাধারণ সহযোগিতা বাংলাদেশকে প্রদান করেছিল, সেটিও আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যারা সারসগুলো বানিয়েছে তারা অনেকেই সাদাকোর বয়সি। তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই, তারা এই সারস তৈরি করার মধ্য দিয়ে একটা আত্মিক বন্ধন তৈরি করেছে হিরোশিমার সেই বোমা বর্ষণে নিহত, আহত এবং দুর্গত মানুষদের প্রতি। আমরা ধন্যবাদ জানাই আগারগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের যে তিন শিক্ষার্থী চমৎকারভাবে সাদাকোর কাহিনীটি পড়ে শোনাল। বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই এসওএস শিশুপল্লীর যে ছোট্ট শিশুরা অনুষ্ঠান পরিবেশন করলো এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সঙ্গে সম্পৃক্ত জল্লাদখানা বধ্যভূমির নবীন-নবীনাদের দল বধ্যভূমির সন্তানদলকে যারা সংগীত পরিবেশন করলো। যখন আমরা হিরোশিমাকে স্মরণ করি, তখন আমরা দেখি জাপানে যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞে মাইলের পর মাইল বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গেছে। সেই দৃশ্য আমাদের মনে করিয়ে দেয় গাজায়, ফিলিস্তিনে বর্তমানে যা ঘটছে। আমরা সবাই চাই যেন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আমরা দৃঢ়ভাবে বলি যে এই শান্তি সর্বত্র বিরাজ করুক। হিরোশিমা দিবস স্মরণের মধ্য দিয়ে আমরা এই ধিক্কার উচ্চারণ করি পৃথিবী থেকে যেন পারমাণবিক বোমা চিরতরে বিলুপ্ত হয়। জাতিসংঘের অনেক উদ্‌যোগ সেখানে রয়েছে এবং জাপান সেখানে একটি মূখ্য ভূমিকা পালন করছে আর বাংলাদেশও এশিয়ার মধ্যে অগ্রবর্তী দেশ যারা এই অপারমাণবিক চুক্তি সাক্ষর করেছে। সকলে মিলে সারা বিশ্বের মানুষের সঙ্গে আমরা যেমন হিরোশিমা ট্রাজেডি স্মরণ করি তেমনি আমরা এ কথাও উচ্চারণ করি যে, পৃথিবী থেকে পারমাণবিক বোমা চিরতরে দূর করা হোক এবং এই মারণাস্ত্রের পিছনে যে অর্থ ব্যয় হয় সেই অর্থ যেন মানুষের কল্যাণে, শিশুদের কল্যাণে, জীবনের বিকাশে ব্যয়িত হয়। সকলের কল্যাণ হোক, শান্তি বিরাজ করুক পৃথিবী জুড়ে সকল গৃহে। পরের পর্বে ছিলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এসওএস শিশুপল্লীর শিশু-কিশোররা হিরোশিমা দিবস উপলক্ষে ‘আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর’ গানের ছন্দে নৃত্য পরিবেশন করে। সবশেষে জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠের বন্ধুদের নিয়ে গঠিত বধ্যভূমির সন্তানদল পরিবেশন করে ‘বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি ...’।

রঞ্জন কুমার সিংহ
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

স্বেচ্ছাসেবী সংলাপ : নেতৃত্ব, গবেষণা ও সক্রিয়তায় স্বেচ্ছাসেবার ভূমিকা

৮ আগস্ট ২০২৫, শুক্রবার বিকেল ৪টা। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার হলে এক উষ্ণ, অনুপ্রেরণায় ভরা বিকেল কাটালেন উপস্থিত সবাই। সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস আয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী সংলাপ সিরিজের এবারের আয়োজন ছিল- Volunteerism at the Liberation War Museum: A Means of Nurturing Leadership, Research and Activism, যা ছিল এক তরুণীর দীর্ঘ যাত্রাপথের গল্প, যেখানে স্বেচ্ছাসেবার হাত ধরে তিনি পৌঁছে গেছেন নেতৃত্ব, গবেষণা ও মানবাধিকারের জগতে।

অনুষ্ঠানের বক্তা ছিলেন তাবাসসুম ইসলাম তামান্না, বিংহ্যামটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং Fall ২০২৫ থেকে Genocide and Mass Atrocity Prevention বিষয়ে এমএসসি শিক্ষার্থী। তামান্না জানান, ২০১৯ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে তার যাত্রা শুরু। সেদিনের অভিজ্ঞতা তার চোখ খুলে দেয় Universal Jurisdiction, Transitional Justice, Humanitarian Law ও Human Rights-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ধারণার প্রতি। এরপর সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (CSGJ)-এ গবেষণা সহকারী হিসেবে কাজ করতে গিয়ে তিনি শিখেছেন নেতৃত্বের গুণাবলি, দলগত কাজের দক্ষতা এবং ন্যায়বিচারের পক্ষে নিরলস প্রচেষ্টার গুরুত্ব।

যদিও পরে তিনি শিক্ষকতা পেশায় যোগ দেন, তবুও সেন্টারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তার সম্পৃক্ততা অব্যাহত থাকে। নিজের প্রেজেন্টেশনে তিনি শুধু CSGJ-এর কর্মকাণ্ড নয়, বরং স্বেচ্ছাসেবক থেকে একাডেমিক ও পেশাগত সাফল্যের পথে তার যাত্রার গল্প শোনান এবং উল্লেখ করেন যে, CSGJ-তে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা তাকে পেশাগত ও ব্যক্তিগতভাবে এমনভাবে গড়ে তুলেছে, যা আজকের সাফল্যের ভিত্তি।

তামান্নার বক্তব্য শেষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও CSGJ-এর পরিচালক মফিদুল হক সমাপনী মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, তামান্না যদিও Never Again ধারণার কথা উল্লেখ করেছেন, তবুও দুঃখজনকভাবে আমরা দেখছি বিশ্বে এখনো গণহত্যার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। তিনি স্মরণ করেন, ২০১৮ সালে তামান্নার বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি প্যানেলিস্ট ছিলেন এবং তিনি সুন্দর আয়োজনের জন্য তার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসা করেন। শেষে তিনি তামান্নার সাফল্যের জন্য শুভকামনা করেন এবং তরুণ প্রজন্মকে আহ্বান জানান, যাতে তারা CSGJ-এর স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমে যুক্ত হয়ে ইতিহাস সংরক্ষণ ও মানবাধিকার রক্ষায় অবদান রাখতে পারে।

সেদিনের বিকেলটি ছিল অনুপ্রেরণার এক বাতিঘর, যা দেখিয়ে দিল স্বেচ্ছাসেবার পথ ধরেই গড়ে ওঠে নেতৃত্ব, গবেষণা আর মানবতার প্রতি অঙ্গীকারের শক্ত ভিত।

অগ্নিজিতা দে সেঁজুতি
রিসার্চ এসিস্টেন্ট, সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস

লিবারেশন ডক কমিউনিটি : সূচনা সমাবেশ

‘লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ’ শিরোনামে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিবছর চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন করে থাকে। লিবারেশন ডকফেস্ট, বাংলাদেশ মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব, যা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মুক্তি ও মানবাধিকারের সংগ্রাম এবং এর সমসাময়িক তাৎপর্য তুলে ধরার চেষ্টা করে।

এই উৎসবের বিভিন্ন কার্যক্রমে যারা নানাসময় আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হয়েছেন বা ছিলেন তাদের চিন্তা ও চলমান কাজ সম্মিলিতভাবে উদ্‌যাপনের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকার উদ্দেশ্যে ‘লিবারেশন ডক কমিউনিটি’ শিরোনামে প্রতিমাসে একদিন একটি কমিউনিটি কর্মসূচির আয়োজনের উদ্দ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৩১ জুলাই ২০২৫ লিবারেশন ডক কমিউনিটির প্রথম কর্মসূচি আয়োজিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার হলে বিকাল ৪টায় ‘লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ’-এর স্বেচ্ছাকর্মী, চলচ্চিত্র নির্বাচন কমিটির সদস্য, কর্মশালার প্রশিক্ষক ও অংশগ্রহণকারীসহ অনেকেই সেদিন উপস্থিত হয়েছিলেন। আয়োজনটিতে আরও উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব এবং ‘লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ’-এর উৎসব পরিচালক মফিদুল হক।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে প্রদর্শিত হয় মিরপুরে অবস্থিত জল্লাদখানা বধ্যভূমি নিয়ে পলাশ রসুল নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র ‘ফ্রোজেন টিয়ার্স’। প্রদর্শনী শেষে উপস্থিত দর্শকরা প্রামাণ্যচিত্রটি নিয়ে মতামত প্রদান করেন। আয়োজনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় পরিচিতি পর্বের মাধ্যমে। নিজ নিজ পরিচয় প্রদানের পাশাপাশি বর্তমানে কে কি করছেন সে অভিজ্ঞতা সবার সাথে ভাগাভাগি করে নেন। কেউ সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাণ করছেন, কেউ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নিবেন আবার কারো নির্মিত চলচ্চিত্র বিভিন্ন উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত ‘ডকুমেন্টারি ফিল্ডওয়ার্ক ২০২৫’ কর্মশালায় নির্মিত ‘শোক, শক্তি, স্বাধীনতা’ নামে প্রামাণ্যচিত্রটি কিছুদিন আগে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়। প্রামাণ্যচিত্রটির নির্মাতা তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন।

অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বে অংশগ্রহণকারীরা ‘লিবারেশন ডক কমিউনিটি’র নিয়মিত কার্যক্রম নিয়ে মতামত প্রদান করেন। ভবিষ্যতে এই কমিউনিটির সবাই কীভাবে যুক্ত থাকতে পারে, কী ধরণের কর্মসূচি ও উদ্যোগ নেয়া যায় ও কীভাবে এটিকে আরো সমৃদ্ধ করা যায় বিষয়ে আলোচনা করেন।

চতুর্থ পর্বে ট্রাস্টি মফিদুল হক রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন-এর ‘সুলতানার স্বপ্ন’ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচির উপর একটি প্রেজেন্টেশন দেন। এই কমিউনিটির মধ্য থেকে তিনি ‘সুলতানার স্বপ্ন’ নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। সবশেষে চায়ের আড্ডার মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচি শেষ হয়।

এম. ফারহাতুল হক
উৎসব সমন্বয়ক, লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ

’৭১-এর গণহত্যার তথ্য যুক্ত হলো কানাডিয়ান জাদুঘরে

১৯৭১ সালে যুদ্ধকালীন ঘটে যাওয়া বাংলাদেশের গণহত্যা বিষয়ক তথ্য সংযোজিত হলো ‘কানাডিয়ান মিউজিয়াম ফর হিউম্যান রাইট্স’-এর ‘ব্রেকিং দ্যা সাইল্যান্স’ নামক গ্যালারিতে। ১৯৭১ সালে যুদ্ধের ভয়াবহতার প্রত্যক্ষদর্শী ও নির্যাতিতদের তথ্য এখানে সংযোজিত হয়েছে। কানাডিয়ান মিউজিয়াম ফর হিউম্যান রাইটস-এর ভাষ্য–

> ‘তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত বর্তমান বাংলাদেশ এর গণহত্যাটি ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে সংঘটিত হয়। দেশটির সরকার তার সামরিক বাহিনীর সাথে মিলে বাঙালিদের সার্বভৌমত্বের আন্দোলনকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে, বাঙালি পরিচয়কে মুছে দিতে এবং অঞ্চলটিকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল জনসাধারণের উপর আক্রমণ চালায়।
>
> যৌন সহিংসতা, গ্রেফতার, জোরপূর্বক বিতাড়ন এবং গণহত্যাসহ বিভিন্ন ধরণের আক্রমণ চালায় তারা। এই গণহত্যার সংখ্যাটি ছিলো ব্যাপক, প্রায় ৩০ লক্ষ। যুদ্ধ শেষে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।’

এ ছাড়াও জাদুঘরটি বাংলাদেশে বসবাসরত কানাডিয়ান কমিউনিটির সহযোগিতায় যুদ্ধ থেকে বেঁচে ফেরা মানুষগুলোর স্মৃতিগুলোকে একত্রিত করে সংরক্ষণ করতে পেরেছে বলে উল্লেখ করেন। তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কাউসার আহমেদ, শেহনাজ রহমান, এমদাদ হক এবং হেলাল মহিউদ্দিনের প্রতি তাদের স্মৃতিকথা প্রকাশ করার জন্য এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কানাডিয়ানদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য।য়য় কাউসার আহমেদ তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ‘বাংলাদেশের গণহত্যাকে এই জাদুঘরে জায়গা করে নিতে দেখে আমি আবেগাপ্লুত। বহুদিন আগেই বাংলাদেশের গণহত্যা বিশ্ব ইতিহাস থেকে প্রায় মুছেই গিয়েছিলো। গণহত্যাটি এই জাদুঘরে সংযোজনের মাধ্যমে যে স্বীকৃতি অর্জিত হলো তা আমাদের বহুদিনের কষ্টকে এবং যাদের হারিয়েছি তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতে সহায়ক হবে।’

কানাডিয়ান মিউজিয়াম ফর হিউম্যান রাইটস মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতি, বিশেষত ট্রাস্টি মফিদুল হকের প্রতি এবং ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানিটোবার প্রফেসর অ্যাডাম মুলারের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

কানাডার জাদুঘরে বাংলাদেশের গণহত্যার এই উপস্থাপন কেবল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জন্যই সম্মানের বিষয় নয় বরং দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য তথা বাংলাদেশের জন্য এক বিশেষ সম্মান এনে দিয়েছে, যা বাংলাদেশের গণহত্যাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদানে আরো এক ধাপ এগিয়ে নেবে।

তাজউদ্দীন আহমদ জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঘটনাগুলো তুলে ধরা, সেই ঘটনাগুলোর বিশ্লেষণ কে কীভাবে করবেন তা ব্যক্তির নিজ দায়িত্ব।

স্মারক বক্তা মাহমুজ আনাম বলেন দুর্ভাগ্যজনকভাবে স্বাধীনতার পর যে স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করেছিলো তা ভঙ্গ হয়। বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরে শুরু হয় অগণতান্ত্রিক যাত্রা, ফলে মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস পাওয়া যায়নি কখনো। বারবার একে অন্যদিকে প্রবাহিত করার প্রবণতা দেখা গেছে, এরই ফলাফল জাতিগতভাবে তাজউদ্দীন আহমদ -এর স্বীকৃতির অভাব। তিনি বলেন সকলকে স্মরণে রাখতে হবে যে তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান রাজনীতিবিদ এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী, গণআন্দোলনে অভ্যস্ত। সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি তাদের ছিল না। ২৫ মার্চ ৪৫ বছর বয়সী যুবক এই নেতাকে খুব অনিশ্চিত এক পরিস্থিতিতে দৃঢ় কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে সশস্ত্র যুদ্ধের পক্ষে। সেখানে তিনি তার দেশের এবং নিজের আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানকে প্রাধান্য দিয়েছেন। শুরুতেই তিনি সীমান্তে গিয়ে ভারতীয় সীমন্তরক্ষীদের খবর পাঠান যে বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ভারতে এসেছেন তারা মুক্তিযুদ্ধ করতে চান, তিনি নিজেকে আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে উপস্থাপন করলেন না, এরপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে তার প্রথম সাক্ষাতের সময়েও তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন যে এটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, আমরা যুদ্ধ করতে চাই স্বাধীনতার জন্য। মাহফুজ আনাম মনে করেন, এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে তিনি বলেন নাই আপনারা আমাদের হয়ে যুদ্ধ করে দেন, বলেছেন এটা আমাদের যুদ্ধ আমরা এই যুদ্ধ করবো, কিন্তু আমাদের সহায়তা দরকার। কতটা আত্মবিশ্বাস আর আত্মসম্মানের সাথে এই সহায়তা চাওয়া। তাঁর এই আত্মবিশ্বাস ইন্দিরা গান্ধীকে আস্থার জায়গায় নিয়ে আসে, ফলে তিনি শুধু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়া, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দেবার ব্যবস্থাই করলেন না, বরং বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে মত তৈরিতে কাজ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকার গঠন এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে তাজউদ্দীন আহমদকে নানান প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হতে হয়েছে কিন্তু তিনি তার দুরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা দিয়ে সব প্রতিকূলতা ও সব বিভাজনকে অতিক্রম করে প্রবাসী সরকারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিলেন, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার প্রশাসনিক দিক দক্ষতার সাথে পালন করলেন। বঙ্গবন্ধু এবং তাজউদ্দীন আহমদের সম্পর্ককে তিনি তুলনা করেন মাও সে তুং ও চৌ এন লাই-এর সম্পর্কের সাথে। তিনি মনে করেন বঙ্গবন্ধুর সাথে তাজউদ্দীন আহমদের যে জুড়ি তা অনন্য। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে তাজউদ্দীন আহমদের আস্থা ছিল অবিচল, এবং কোন সন্দেহ বা প্রশ্নের ঊর্ধ্বে। আবার তাজউদ্দীন আহমদের যে সাংগঠনিক দক্ষতা সেখানে বঙ্গবন্ধুর আস্থাও ছিল অবিচল। তাঁদের এই পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং নৈকট্যই তাঁদেরকে পরস্পরের সম্পূরক হিসেবে তৈরি করেছে, ফলে আওয়ামী লীগ দল হিসেবে সুসংগঠিত হয়েছে, ৭০-এর নির্বচনে জয়লাভ করেছে এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক বলেন, আমরা প্রত্যাশা করবো তাজউদ্দীন আহমদ-এর জন্মশতবর্ষ যেন তাজউদ্দীন চর্চায় নতুন ধারার সূচনা করে, সেটা হবে মুক্তিযুদ্ধকে জানার, বোঝার চর্চা। তিনি মনে করেন ইতিহাসকে অনেক ক্ষুদ্রতার মধ্যে নিয়ে আসা হয়, নানা বিকৃতি নানা বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা করা হয়। তাজউদ্দীন আহমদ-এর জন্মশতবর্ষে তাজউদ্দীন আহমদ-এর প্রতি দায়, ইতিহাসের প্রতি দায় আমাদের মেটাতে হবে আর সেটি করতে গেলে আজকের প্রজন্মকে নানাভাবে ইতিহাসের অধ্যয়নে যুক্ত হতে হবে। এই অধ্যায়নে তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, উইন্সটন চার্চিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কয়েক খণ্ডে যে ইতিহাস লিখেছিলেন তার একটি খন্ড ছিল Our Finest Hour। এটি ছিল বৃটেনের সবচাইতে কঠিন সময় যখন বৃটেন চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে গিয়েছিলো, এবং কী করে বৃটেন তখন তা রুখে দিয়েছিলো তার ইতিহাস। একইভাবে বাঙালি জাতির উদ্ভবের ইতিহাসে Finest Hour-এর একদিক হলো মুক্তিযুদ্ধ, এই মুক্তিযুদ্ধ তাজউদ্দীন আহমদ-এর জীবনেও Finest Hour। বাঙালির ইতিহাসের এই পর্ব জানার জন্য তরুণ প্রজন্মকে সচেষ্ট থাকতে হবে। তিনি বলেন, ইতিহাস একইসাথে নির্মোহ, নিষ্ঠুর আবার উদার। যার যা অবদান ইতিহাস সেটা কখনো ভোলে না, ইতিহাস সেটি ফিরিয়ে দেয়। এই ফিরিয়ে দেয়ার সাধনাই সমাজ মুক্তির সাধনা। আর এই সাধনার মধ্য দিয়ে তাজউদ্দীন আহমদ-এর জন্মশত বর্ষ ইতিহাসের সঙ্গে নতুনভাবে পরিচয় করিয়ে দেবে বলে সকলেই আশা প্রকাশ করেন।

আয়োজনে সংগীত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শিল্পী তানিয়া মান্নান, তাজউদ্দীন আহমদ-এর ডায়েরি থেকে পাঠ করেন আবৃত্তিশিল্পী মহিউদ্দিন শামীম, চিঠি থেকে পাঠ করেন আবৃত্তিশিল্পী সৈয়দ শহীদুল ইসলাম নাজু, ‘সাক্ষী ছিলো শিরস্ত্রণ’ উপন্যাস থেকে পাঠ করেন আবৃত্তিশিল্পী শিরিন ইসলাম এবং তাজউদ্দীন আহমদকে নিবেদিত কবিতা আবৃত্তি করেন আবৃত্তিশিল্পী মাহিদুল ইসলাম।

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়
‘সুলতানার স্বপ্ন’ : আলোচনা

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের ‘সুলতানার স্বপ্ন : ইউনেস্কো স্বীকৃতি ও বর্তমান তাৎপর্য’ শীর্ষক আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় ঢাকার ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞান বিভাগের উদ্‌যোগে। ১০ আগস্ট ২০২৫, সকাল ১১টায় শুরু হওয়া এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. শামস্ রহমান। সভাপতিত্ব করেন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. ফওজিয়া মান্নান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনায় সুলতানার স্বপ্ন নিয়ে আয়োজনের বিস্তারিত বিবরণ প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন, ১২০ বছর আগে রোকেয়ার লেখা বিজ্ঞানমনস্ক মানবিক কল্পকাহিনী ‘সুলতানার স্বপ্ন’ গ্রন্থ বাংলাদেশের এবং বিশ্বের সমাজ ব্যবস্থায় এখনও সমান প্রাসঙ্গিক। ইউনেস্কোর এশিয়া প্যাসেফিক অঞ্চলে সুলতানার স্বপ্নের স্বীকৃতির পর চেষ্টা করা হচ্ছে বৃহত্তর পরিসরে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ইউনেস্কোর স্বীকৃতির আবেদন করেছিল ফলে এটা নিয়ে জাদুঘর ব্যাপক কর্মকাণ্ড নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এর সঙ্গে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির মতো যুক্ত হয়েছে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ, ইউকে-র ইউনিভার্সিটি অব এডিনবরা এবং ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি, ‘সুলতানার স্বপ্ন অবারিত’ পতাকা নিয়ে হিমালয়ে অভিযান পরিচালনা করেছেন নিশাত মজুমদারসহ তার অভিযাত্রী দল। সুলতানার স্বপ্নকে বুকে ধারণ করে পথ-শিশুদের নিয়ে কাজ করছে লিডো পিস হোম এবং বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহ করছে নানামূখী সফল আয়োজন। পাঠক্রমে রোকেয়ার অন্তর্ভুক্তি কীভাবে সাবলিল করা যায় সে বিষয়েও একটি প্রকল্প গ্রহণের কাজ চলমান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. শামস্ রহমান বলেন, সুলতানার স্বপ্ন বইটি খুব ছোটো কিন্তু খুবই শক্তিশালী। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলেও এই বইয়ে রয়েছে বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিজ্ঞান, কলা ও সাহিত্য, অর্থনীতি ও সমাজনীতি, সমরকৌশল, যুক্তিবিজ্ঞান, শান্তি ও সাম্যের কথা এবং শান্তিপূর্ণভাবে নারীর ক্ষমতায়ন। রোকেয়া প্রেম ও সত্যকে ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি রোকেয়ার মডেল ‘লেডি ল্যান্ডে’র সুফল হিসেবে আমাদের ‘জেনারেল ল্যান্ড’কে প্রস্তুত করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এটাই হবে রোকেয়া চর্চার মূল লক্ষ্য।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেন, আমাদের দেশে নারীদের বিশেষ কাজের জন্য মূল্যায়ন করা হয় না; সম্মানের পরিবর্তে দেয়া হয় অবজ্ঞা। নারী কোটার করুণা দিয়ে তাদের স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। নারীকে সমানভাবে প্রতিযোগিতা করে মেধার ভিত্তিতে স্থান করে নিতে হবে। রাজনৈতিক ক্ষমতা নারীকে এগিতে নিতে পারে।

অনুষ্ঠানে সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান করেন প্রধান অতিথি মফিদুল হক।

এস এম মোহসীন হোসেন
সাম্মানিক ব্যবস্থাপক, শিক্ষা কর্মসূচি
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

শ্রদ্ধাঞ্জলি
বীর মুক্তিযোদ্ধা ওহিদুর রহমান

আত্রাই অঞ্চলের বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক এমপি ওহিদুর রহমান সদ্য প্রয়াত হয়েছেন। ওহিদুর রহমান পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির (এমএল) নেতা ছিলেন। ১৯৭১ সালে পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ওহিদুর রহমান তাঁর দলের কেন্দ্রীয় কমিটির এই সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখান করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আত্রাই অঞ্চলের বামপন্থী কর্মীদেরকে নিয়ে ‘আত্রাই কমিউনিস্ট পার্টি’ নামে দল তৈরী করে এই দলের ব্যানারে মুক্তিযুদ্ধ করেন। তিনি আত্রাই অঞ্চলে প্রায় এক হাজার সদস্যের নিয়মিত মুক্তিবাহিনী গঠন করেন। পাশাপশি প্রায় আট শত স্বেচ্ছাসেবক বহিনীও ছিল। তৎকালীন নওগাঁ মহকুমার আত্রাই, রাণীনগর, মান্দা, মহাদেবপুর, নিয়ামতপুর, রাজশাহীর বাগমারা, তানোর, নাটোরের সিংড়া, নলডাঙ্গা, মাধনগর, খাজুরা, বগুড়ার আদমদিঘী, নন্দীগ্রাম এসব বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছিল ওহিদুর বাহিনীর দাপট। এই সব অঞ্চলের বড় বড় বিলের মধ্যের গ্রামগুলো হয়ে উঠেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের অভয়ারণ্য।

একাত্তরের মার্চ মাস থেকে আগষ্ট মাস পর্যন্ত বামপন্থী মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ওহিদুর রহমানের নেতৃত্বে এই বিশাল বহিনী ভারতে না গিয়ে ভারতের সহযোগিতা ছাড়াই স্থানীয়ভাবে অস্ত্র সংগ্রহ করে পাকিস্তানী সেনা ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে। এসব অঞ্চলের বিভিন্ন থানা, রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে অস্ত্র সংগ্রহ করতো ওহিদুর বাহিনী। আর এসব অস্ত্র দিয়েই পাকিস্তানী বহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতো। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল আত্রাইয়ের তারানগর-বাউল্লাতে আত্রাই নদীর মধ্যে ও রাণীনগর থানার নলদিঘী গ্রামে। এ দুটি যুদ্ধে ওহিদুর রহমান ও তাঁর বাহিনী বীরত্বের সাথে লড়াই করেছিল। সঠিক নেতৃত্বের কারণেই দুটি যুদ্ধেই মুক্তিবাহিনীর কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ওহিদুর রহমান এ বিশাল অঞ্চলটির অধিকাংশ জায়গা মুক্তাঞ্চলে পরিণত করেছিলেন।

উল্লেখ্য, ওহিদুর রহমান ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের একজন সুহৃদ। আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উপলক্ষে ২০০৮ সালের ১৭ মে ঢাকা সেগুনবাগিচায় অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ‘আত্রাই বঙ্গীয় রিলিফ কমিটির (খাদি প্রতিষ্ঠান/গান্ধী আশ্রম)’ পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে মহাত্মা গান্ধী ও প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ব্যবহৃত একটি চরকা (স্মারক) প্রদান করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ওহিদুর রহমান।

ফরিদুল আলম পিন্টু
সাংবাদিক, লেখক ও গবেষক
আত্রাই, নওগাঁ।

প্রতক্ষ্যদর্শীর ভাষ্যে মুক্তিযুদ্ধ

তিয়াত্তর বছরের এক নারী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এসে ফিরে গেছেন তার শৈশব- কৈশোর-যৌবনের দিনগুলোতে। চোখের সামনে ভেসে উঠছে অতীতের ভয়ঙ্কর সব স্মৃতি। ছোট ভাইয়ের সাথে জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইন্সটিটিউটে ডাক্তার দেখানো শেষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দেখতে এসেছিলেন নূরজাহান বেগম। ভাষা আন্দোলনের বছরে জন্ম নেওয়া নূরজাহান বেগম নারায়ণগঞ্জ গার্লস হাই স্কুল থেকে ১৯৭০ সালের উত্তাল সময়ে ম্যাট্রিক পাশ করেন। রাজনীতিতে সক্রিয় না থাকলেও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতেন পত্রিকা আর রেডিওর কল্যাণে। স্কুলে থাকা অবস্থায় ৬৮ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে বেশ কয়েকবার মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্লোগান দিয়েছিলেন 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো'। ১৯৭১ সালের জানুয়ারির ১ তারিখে এসিআই কোম্পানিতে শুরু হয় কর্মজীবন, অফিস নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল।

একাত্তরের মার্চ মাসে ঢাকার রাজনৈতিক অস্থিতিশীল অবস্থা ছড়িয়ে যায় সারা বাংলাদেশে, নারায়ণগঞ্জেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ২৫শে মার্চ ঢাকায় গণহত্যা শুরু হলে ঢাকার মানুষজন প্রাণ বাঁচাতে ছুটে চলে শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে। ২৬শে মার্চ নারায়ণগঞ্জে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। জীবন বাঁচাতে সবাই যার যার মতো ছুটতে থাকে। এই সময়ে বাড়ির বিহারি দারোয়ান গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। নূরজাহান বেগমের বাবা পরিবারের সবাইকে নিয়ে নদী পাড়ি দেয়। পথের মধ্যেই দেখতে পায় দাউদাউ করে জ্বলে ওঠা আগুন। আশ্রয় মেলে লাঙ্গলবন্দের এক দরিদ্র পরিবারে। দুই-তিন মাস সপরিবারে সেখানেই ছিলেন। লাঙ্গলবন্দের পরিস্থিতি খারাপ হতে শুরু করলে বাবা সিদ্ধান্ত নেন বাড়ি ফিরে যাবার। বাড়ির আশপাশে বেশ কয়েকজন বিহারি ছিল, তারা ভালো ছিল। বাঙালিদের ঘরবাড়ি লুট করেনি কিংবা পাকিস্তানিদের সহযোগিতা করেনি।

ডন চেম্বার রোডের বাড়িতে ফিরে এসে বাংকার তৈরী করেন নূরজাহান বেগমের বাবা, যিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত একজন বাঙালি। অধিকাংশ সময় সেখানেই কেটেছে তাদের। একদিন পাকিস্তানি আর্মিরা এসে তার বাবার নাম ধরে ডাকতে থাকে। সবাই ভয়ে অস্থির, আজকেই বুঝি সব শেষ, পরে দেখা গেল বাবার সহকর্মী বন্ধু ঠিকানা খুঁজে চলে এসেছে বন্ধুর সাথে। এতবছর পর দুঃসময়েও বন্ধুকে পেয়ে তাদের কি আনন্দ। অত্যাচার না করে একটা কার্ড দিয়ে গেলেন বাঙালি বন্ধুকে, যেটা দেখালেই মুক্তি মিলবে বর্বর পাকিস্তানিদের হাত থেকে। যুদ্ধের শুরুতে কয়েকমাস কর্মবিরতি থাকলেও পরবর্তীতে নির্দেশ ছিল সম্ভব হলে কাজে যোগ দেওয়ার। চাকরি বাঁচাতে মৃত্যুর ভয় নিয়েও সম্ভব হলে অফিসে যেতেন। অফিস থেকেই যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল। প্রায় দিনই গাড়ি থামিয়ে পাকিস্তান আর্মি চেক করতো মুক্তিবাহিনী আছে কিনা, সেদিন নূরজাহান বেগমের মনে হতো এই বুঝি জীবনের শেষ দিন। সেই স্মৃতি মনে পড়লে এখনও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন তিনি। তাদের পরিচিত অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে এবং শরণার্থী হিসেবে ভারতে গিয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনেকের সাথে দেখা হয়েছে, অনেকের সাথে আর কখনোই দেখা হয়নি। দীর্ঘ নয়মাস যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীন দেশে শুরু হয় নতুন জীবন। অথচ অনেকের জীবন থেমে যায়। প্রাণ দেয় দেশের তরে, যারা আর ফিরে আসেনি ঘরে। দেশ স্বাধীন হবার কথা জানতে পারে বাবার কাছ থেকে। বেরিয়ে আসে বাঙ্কার থেকে। বিজয় উদ্‌যাপনে মেতে উঠে সবাই।

ইয়াছমিন লিসা, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

শ্রদ্ধার্ঘ্য : মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পরম সুহৃদ চিত্রশিল্পী-ভাস্কর হামিদুজ্জামান খান

১৬ মার্চ ১৯৪৬- মৃত্যু: ২০ জুলাই ২০২৫)

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর-এর দীর্ঘদিনের সাথী ও সুহৃদ শিল্পী-ভাস্কর হামিদুজ্জামান খান গত ২০ জুলাই ২০২৫ মৃত্যুবরণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে হামিদুজ্জামান খান জাদুঘরকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর শিল্পকর্মের ছোঁয়ায়। সেগুনবাগিচাস্থ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে তিনি প্রদান করেছিলেন একাত্তরের উপর নির্মিত ভাস্কর্য যা জাদুঘরের গ্যালারিতে প্রদর্শিত হয়। ২০১৬ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যখন আগারগাঁওস্থ নিজস্ব ভবনে স্থানান্তর হয় সেখানেও জাদুঘরের প্রদর্শনী কাজে হামিদুজ্জামান খান রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান। গ্যালারির প্রবেশদ্বারে সাত বীরশ্রেষ্ঠ স্মরণে দিব্যকের বিজয় স্তম্ভের আলোকে যে সাতটি পিলার নির্মাণ করা হয়েছে তার উপরে অগ্নির লেলিহান শিখার ডিজাইন ও বাস্তবায়নও তিনি করেছেন। ২০১৮ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর-এর উদ্যোগ ও সহায়তায় মিয়ানমারের Nordic House ও OK Gallery- তে অনুষ্ঠিত Art for Humanity শীর্ষক কর্মশালা ও প্রদর্শনীতে বাংলাদেশ থেকে চারজন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন তার মধ্যে হামিদুজ্জামান খান ছিলেন অন্যতম। প্রদর্শনীতে তাঁদের আঁকা শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। এই প্রদর্শনী ও কর্মশালাতে বাংলাদেশের চিত্রকর্ম ও ভাস্কর্যশিল্পসহ বাংলাদেশকে বিশেষভাবে উপস্থাপন করেন হামিদুজ্জামান খান।

শ্রদ্ধার্ঘ্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কোর মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড হিসেবে স্বীকৃতি পায় ২০১৭ সালে।

The Historic 7th March Speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

"The Historic 7th March Speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman" was delivered by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on 7th March, 1971 who led the people of Bangladesh to independence in 1971. At that time when the Pakistani military rulers refused to transfer power to the Bengali nationalist leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, whose party Awami League gained majority in the National Assembly of Pakistan in the general election held in 1970. The speech effectively declared the independence of Bangladesh. The speech constitutes a faithful documentation of how the failure of post-colonial nation-states to develop inclusive, democratic society alienates their population belonging to different ethnic, cultural, linguistic or religious groups. The speech was extempore and there was no written script. However, the speech survived in the audio as well as AV versions."

সুলতানার স্বপ্নপাঠ কর্মশালা

পিস হোমের অংশ নেয়া সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের কথা

সুলতানার গল্প

সুলতানার গল্পটি থেকে সবুজ ঘাস ও গাছপালা, পশু-পাখি এগুলো আমার মন ভরে দিয়েছে। যদি এগুলো আমার সমাজে হতো তাহলে কতো ভালো হতো।

আমার স্বপ্ন

আমি যেই সমাজে বাস করি সেই সমাজকে নিয়ে আমার স্বপ্ন, আমি চাই যাতে করে একটি শিশু রাস্তায় না থাকে এবং সবাই যাতে স্বাধীনভাবে চলতে পারে। এই সমাজটাকে আমি আমার মতো সুন্দর করে সাজাতে চাই। এটা আমার স্বপ্ন।

স্বাধীন
২২/০৬/২০২৫

সুলতানার গল্প

সুলতানার স্বপ্ন নামক বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী গল্পটি পড়ে আমার ভালো লেগেছে। উড়ন্ত গাড়ি, এই গাড়িটি অনেক ভালো লেগেছে।

আমার স্বপ্ন

আমার স্বপ্ন হলো সমাজটাকে সুন্দর করে সাজাতে চাই, সবাই যাতে স্বাধীনভাবে চলতে পারে। আমি চাই গল্পটির মতো আমাদের দেশেও উড়ন্ত গাড়ি থাকবে। এটা আমার স্বপ্ন।

রাব্বি
২২/০৬/২০২৫

সুলতানার গল্প

সুলতানার গল্পটি পড়ে 'সুলতানার স্বপ্ন' নামক বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিটি ভালো লেগেছে, কারণ এটি যখন আমি পড়েছি তখন আমি গল্পটির মধ্যে হারিয়ে গেছিলাম। যদি সুলতানার গল্পটি সত্যি হতো তাহলে খুব ভালো হতো।

আমার স্বপ্ন

আমি যেই সমাজে বাস করি তা নিয়ে আমার স্বপ্ন সুলতানার মতো। আমি চাই যাতে করে একটি শিশুও রাস্তায় না থাকে, মেয়েরা যাতে স্বাধীনভাবে চলতে পারে, সবাই মিলে মিশে থাকবে। সবাই সবাইকে ভাই-বোনের মতো দেখবে। এই সমাজকে নিয়ে এটাই আমার স্বপ্ন।

শিউলি
২২/০৬/২০২৫

সুলতানার স্বপ্ন

'সুলতানার স্বপ্ন' বইটিতে সুলতানার জীবনের যে দিকটি ছিল, আমার কাছে খারাপ লাগে সেটি হলো ছেলেমেয়েদের মধ্যে বৈষম্য বা দৃষ্টিভঙ্গির দিকটা। মেয়েদের বাড়ির বাইরে বের হতে দেয় না, পড়ালেখা করতে দেয় না। ছেলেদের সাথে চলা যাবে না। বইটির ভিতর সুলতানার স্বপ্ন কেমন ছিল, সুলতানার স্বপ্ন ছিল মেয়ে ও ছেলেদের দেখার দৃষ্টিভঙ্গি। ছেলেরা বাইরে কাজ করে, মেয়েরা বাড়ির কাজ করে, এই যে বৈষম্য করা হয় সেটা তুলে ধরে এই গল্প।

আমার স্বপ্ন

আমার দেশে গ্রাম অঞ্চলে দেখা যায় যে, মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দিয়ে দেয় এবং পড়ালেখা করতে দেয় না। মেয়েদের ভাবা হয় তারা শুধু ঘরে কাজ করবে। শহরে কোনো ভেদাভেদ নাই, ছেলে মেয়ে সবাই সমান। মেয়েরা পড়ালেখা করে অনেক বড় বড় অফিসে কাজ করে ছেলেদের মত। শহরে কোনো বৈষম্য না থাকার কারণে আমি পড়ালেখা করে আমার স্বপ্ন পূরণ করতেছি। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন।

সাথী

আমার স্বপ্ন

শোকবার্তা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ তবলাশিল্পী মঞ্জুর হোসেন খান গত ১৫ জুলাই ২০২৫ মৃত্যুবরণ করেন। ২০০৮ সাল হতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালিত মিরপুরস্থ জল্লাদখানা বধ্যভূমিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি নিয়মিত তবলা সঙ্গত করেছেন। শহিদ পরিবারের তৃতীয় প্রজন্মের সন্তানদের নিয়ে গঠিত সংগঠনের সাথে দীর্ঘদিন তবলা সঙ্গত করেছেন। তার অকাল প্রয়াণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গভীরভাবে শোকাহত। মুক্তিযুযদ্ধ জাদুঘরের সাথে তার এই সম্পৃক্ততা সর্বদা উজ্জ্বল হয়ে রইবে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দর্শনার্থীদের মন্তব্য

আমি মেরী লিজা ম্রং। আমি গর্বিত আমার বাবা, বড় মামা ও দুই ফুফা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। এই দেশকে গড়তে তাদের অবদান রয়েছে। এখানে এসে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জেনে নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করেছি।

মেরী লিজা ম্রং

আমি নীলাদ্রি বি এফ শাহীন কলেজের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। আমি এতদিন বইয়ে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যা পড়েছি তা জাদুঘরে এসে আরও অনেক কিছু দেখলাম এবং জানলাম পাকিস্তানি বর্বরতা। আমাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছে দেশের অনেক মানুষ জীবন দিয়েছেন এবং নির্যাতিত হয়েছেন। আমরা তাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করব ও দেশকে অনেক ভালোবাসব।

নীলাদ্রি

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সাক্ষিগুলোকে সুন্দরভাবে সংরক্ষণের জন্য ধন্যবাদ। বাংলাদেশ আরও সমৃদ্ধশালী হোক।

মো: শাহিনুর রহমান
বিরল, দিনাজপুর

শেষ পৃষ্ঠা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **মফিদুল হক**, ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official